জ্ঞানদীপ্তি কাকে বলে

ইমানুয়েল কান্ট

(১৭৮৪ সালের মাঝামাঝি, অর্থাৎ আজ থেকে দু-শ এগারো বছর আগে, এক জার্মান পত্রিকা পাঠকদের কাছে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে মতামত জানতে চায়। তেমন একটি বিষয় ছিল আউফক্লেয়ারুঙ বা জ্ঞানদীপ্তি বা 'এনলাইটেনমেণ্ট'। নভেম্বর মাসে, উক্ত প্রসঙ্গে, জনৈক পাঠকের এক চিঠি প্রকাশিত হয়।

পত্রলেখকের নাম ইমানুয়েল কাণ্ট।

কাণ্ট-এর বিপুল, প্রভাবশালী দর্শনতত্ত্বের পাশে এটি একটি সামান্য রচনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গত দুই শতাব্দী ধরে এই পাতা সাতেকের পত্র-প্রবন্ধ বহু বিতর্কে জলসিঞ্চনের কাজ করেছে। এর গূঢ় অর্থ, উচ্চারিত প্রশ্ন এবং তার দ্বিধাহীন উত্তর, তাত্ত্বিক এবং প্রয়োগভিত্তিক সন্দেহ নিয়ে কাজ করেছেন হেগেল, নীট্‌শে, হেবার, হর্কহেইমার ও অ্যাডরনো। শেষোক্ত দু-জনের লিখিত 'ডায়ালেকটিক অফ এনলাইটেনমেণ্ট' বা জ্ঞানদীপ্তির দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। আমাদের সময়ে মিশেল ফুকো এবং য়ুরগেন হাবেরমাস-এর প্রভাবশালী তাত্ত্বিক বিতর্কের কথাও আমাদের এই সূত্রে মনে পড়ে।

কী আছে এই মারাত্মক রচনায় যা বস্তুত একটি খোলা চিঠি? এর মৌলিকত্ব কোথায়? কোথায় বা এর অন্তঃসলিল?

বস্তুত, এনলাইটেনমেণ্ট শব্দটি তৎকালে শিক্ষিত লোকদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা ছিল না। যে

জার্মান পত্রিকাটির উল্লেখ করেছি সেটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ পাঠকশ্রেণীর কাছে এক ধরনের আবছা ধারণাবাহী প্রসঙ্গ নিয়েই চিঠিপত্র ছাপাতে শুরু করে করে। কাণ্ট-এর এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার ছ-বছর আগে মারা যান ভলতেয়ার ('ন্যাচারাল রাইট্স'-এর প্রবক্তা) এবং রুশো ('সোস্যাল কনট্রাক্ট'-এর প্রবক্তা)। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং সেই সরকারের সঙ্গে সমাজ ও ব্যক্তি-নাগরিকের সম্পর্ক কী হবে—এই ছিল এললাইটেনমেণ্ট যুগের প্রধান অনুসন্ধানের বিষয়।

প্রসঙ্গত এটাও বলা দরকার, এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছর পর বাস্তিল আক্রান্ত হয় এবং তারও বছর তিনেক পর, অর্থাৎ ১৭৯২ সালে ফরাসীদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এমন ভাবা ঠিক নয় যে এইসব বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্ম, বাকস্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি নিয়ে বিতর্ক নিম্ন মধ্যবিত্ত, স্বল্পশিক্ষিত ইয়োরোপীয় নাগরিকদের স্পর্শ করেনি। হিসেব আছে যে ঐ শতাব্দীর প্রথম দশকেই লণ্ডন শহরে তিন হাজারের বেশি কফিহাউস ছিল।

জ্ঞানদীপ্তির দু-টি প্রধান বক্তব্য প্রায় সকলেই তখন মেনে নিয়েছিলেন। প্রথমত, সব কাজে যুক্তির বা 'র‍্যাশনালিটি'-র অপরিহার্যতা চাই এবং দ্বিতীয়ত, মানবসমাজ কালক্রমে উন্নত হয়ে উঠছে অর্থাৎ ইতিহাস-পাঠে আমরা জানতে পারছি যে 'প্রোগ্রেস' ঘটছে। এই দু-টি সিদ্ধান্তের, শুধু সরলীকৃত চরিত্র নয়—মূল সূত্রগুলিও সন্দেহ উদ্রেক করে।

আশ্চর্যের কথা, আজও সর্বত্র আধুনিকতা, যুক্তিবাদ, বিমূর্তন-প্রক্রিয়া নিয়ে তর্ক উঠলে এই অনূদিত লেখাটির উল্লেখ হয়। কয়েকজন প্রভাবশালী আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ এমনও মনে করেন যে কাণ্ট-এর এই লেখার বক্তব্য সম্পূর্ণ বিমূর্ত। সেজন্য এর বিতর্কিত চরিত্র এবং প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে এটি বাংলায় অনুবাদ করা হল।

অনুবাদ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে রাখি। ক্যাথরিন পোর্টার-এর ইংরেজি থেকে লেখাটি অনুবাদ করা হয়েছে। কয়েক জায়গায় জার্মান-ভাষীর সাহায্য নিতে হল। তবু কিছু শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যের মধ্যে ফারাক চোখে পড়ে। যেমন আউফক্লেয়ারুঙ শব্দটির আমরা অনুবাদ করেছি জ্ঞানদীপ্তি। ইংরেজিতে মানেটা দাঁড়ায় 'ক্লিয়ার আপ' বা বাংলায়, অবহিত করা, জানানো, কোনো বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ লোককে জ্ঞানদান করা। কাণ্ট অবশ্য, বিশদভাবে, এই রচনায় বলেছেন যে অপ্রাপ্তবয়স্ক, পরনির্ভরশীল অবস্থা থেকে মানুষ তখনই বেরিয়ে আসতে পারে যখন সে যুক্তিবাদী জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ করতে শেখে।

আবার এমন প্রশ্ন আপনারা তুলতে পারেন, কাণ্ট যে-আলোকপ্রাপ্তির কথা বলছেন তা কি একটি ঘটনামাত্র (ফেনোমেনন)? আপনা থেকেই ঘটবে? নাকি বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে এটি ঘটানো আমাদের দায় বা কর্তব্য?

নিশ্চয়ই আপনাদের মনে এ-প্রশ্ন জাগবে যে 'জনগণ' বলতে কাণ্ট কি আপামর জনসাধারণ বোঝাতে চাইছেন, যাকে আমরা ইংরেজিতে বলতে পারি 'ম্যানকাইণ্ড'? নাকি এক বিশেষ রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে অবস্থিত এক জাতির কথা বলা হচ্ছে? যেমন, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রাশান জাতি?

হয়তো আমাদের 'প্রাইভেট' এবং 'পাবলিক' শব্দদুটির ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে সময় লাগবে। 'প্রাইভেট' বলতে কাণ্ট বুঝেছেন সেই জগত যেখানে জীবিকা বা চাকরির জন্য, বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও, আমাদের কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে কাজ করা উচিত। এবং সেইসঙ্গে, এক নিশ্বাসে তিনি বলছেন, বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে, অর্থাৎ 'পাবলিক' ক্ষেত্রে, লেখায় ও বক্তৃতায় আমার প্রতিটি সংশোধন চিন্তা বা বিরুদ্ধমত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই।

এইসব বৈপরীত্য, এদের প্রয়োগের সম্ভাবনা-বিচার, আমাদের চিন্তা ও কর্মের জগতের উপর তাদের প্রভাব—একালেও গভীর অনুশীলনের বিষয়।

*

আমি অনুবাদে পাঠের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ, যৌগিক বাক্যকে ভেঙে দুটি-তিনটি বাক্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। তাছাড়া, বাংলা গদ্যের একটা অন্তর্নিহিত ছন্দ আছে যা

অগ্রাহ্য করলে যে-কোনো রচনা তার পাঠযোগ্যতা হারায়। আশা করি, মনীষীরা এই সামান্য অথচ প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাটুকু বাঙালি অনুবাদককে দিতে দ্বিধা করবেন না। খবরের কাগজে, পাঠককে উদ্দেশ্য করে, জগৎবরেণ্য দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট যে-চিঠি লিখেছিলেন, তা-ও ছিল সহজ ও সাবলীল বিন্যাসে রচিত একটি পত্র-প্রবন্ধ মাত্র।

অনুদিত লেখাটির উপর চোখ বুলিয়ে আমার এক স্থিতধী বন্ধু মন্তব্য করেন— আপনারাও কি শেষপর্যন্ত মৌলবাদী হয়ে উঠলেন নাকি? আমার ম্লান হাসি, তাঁকে যথেষ্ট আশ্বস্ত করেনি। আপনারা কী বলেন?)

স্বেচ্ছায় অপরের হাতে নিজের অভিভাবকত্ব তুলে-দেওয়া থেকে মুক্তির নাম জ্ঞানদীপ্তি (এনলাইটেনমেন্ট)। মানুষ যখন তার স্বীয় বিচারবুদ্ধিকে না খাটাতে চায় এবং অন্যের নির্দেশে চলে তখনই অন্যজন তার অভিভাবক হয়ে দাঁড়ায়। একে স্বেচ্ছাকৃত বলব এই জন্য যে যুক্তির কোনও অভাব বস্তুত মানুষের থাকে না। থাকে সাহস ও উদ্যমের অনটন। তার ফলে, অন্যের নির্দেশ ছাড়া সে অনড়। **সাপেরে অডে** ! Sapere aude[১] (ইংরেজিতে যার মানে দাঁড়ায় 'অডাসিটি টু নো'।) 'নিজের যুক্তিকে ব্যবহার করার মতো সাহসী হও' — এই জ্ঞানদীপ্তির মর্মবাণী।

প্রকৃতির নির্দেশে চালিত হওয়ার যুগ বহুকাল আগে শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আলস্য এবং ভয়ের কারণে আজীবন অপরের নির্দেশে চালিত হয়। সেজন্য অপর ব্যক্তিরা তাদের কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়ে থাকা কত সহজ। যদি কোনও গ্রন্থ আমার হয়ে বুঝে ফ্যালে, কোনও যাজক যদি আমার বিবেকের দায়িত্ব নেন, কোনও চিকিৎসক যদি আমার খাদ্যের বিধান নির্দিষ্ট করে দেন, তবে, এবং এরকম আরও অনেক কাজে, আমার নিজের মাথা-ঘামানোর কোনও প্রয়োজন থাকে না। কিছু টাকাকড়ি ধরে দিলেই অন্যেরা, আমার হয়ে, অনায়াসে এসব বিরক্তিকর কাজগুলি করে দেবে। আমার চিন্তাভাবনা করার কোনও প্রয়োজন থাকবে না।

আমাদের রক্ষকরা — যারা দয়াপরবশ হয়ে আমাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন— দেখেছেন যে বৃহত্তর জনসাধারণ [এবং সমগ্র নারীজাতি] মনে করে স্বনির্ভর (কর্মাপটেন্ট) হয়ে-ওঠার পথ কষ্টকর তো বটেই, এমনকি ঘোর বিপদসঙ্কুল।

ঐ রক্ষকরা তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে প্রথমত বোবা করেন এবং তারপর নিজেরা নিশ্চিন্ত হন এই ভেবে যে শান্ত পশুগুলির গলায় লাগাম না পরিয়ে দিলে তারা এক পা এগোনোর সাহস পাবে না। অতঃপর তাঁরা পশুগুলিকে একা একা চলাফেরা করার সম্ভাব্য বিপদ-আপদ দেখিয়ে দেন। বস্তুত, স্বচেষ্টায় চলমান হওয়ার বিপদ এমন কিছু বেশি নয়। কয়েকবার পড়ে যাওয়ার পর পশুগুলি শেষ পর্যন্ত নিজেরাই ঠিকঠাক হাঁটতে পারবে। কিন্তু ঐ অসমর্থতার উদাহরণ তাদের আতঙ্কিত করে এবং সাধারণত ভবিষ্যত সবরকম পরীক্ষা থেকে তাদের ভয়ে সরিয়ে রাখে।

---

১. 'জানার সাহস চাই' (হোরেস, আর্স পোয়েটিকা)। জার্মান এনলাইটেনমেন্ট সম্প্রদায়ের একটি শাখা, 'সোসাইটি ফর দ্য ফ্রেণ্ডস অফ ট্রুথ'' ১৭৩৬ সালে ঐ বাণীকে তাদের 'মটো' বা মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে।

যদি কোনও মানুষ আজীবন অপরের অভিভাবকত্বে চালিত হয় তবে সেটা প্রায় হয়ে দাঁড়ায় তাঁর স্বভাব (নেচার) এবং সেই জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। ঐ অবস্থাকে সে যেন ভালবাসতে শুরু করে। সাময়িকভাবে সে সত্যিই নিজের যুক্তি ব্যবহারে অক্ষম কেননা কেউ তাকে চেষ্টা করে দেখতে দেয়নি। যুক্তিপূর্ণভাবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করার জন্য যেসব আইন ও ফর্মুলা মানুষ স্বভাবগুণে তৈরি করেছে সেগুলিই হয়ে দাঁড়ায় তার চিরকালের শৃঙ্খল। যে সেই শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে সে একটি ছোট্ট ফাটল অনিশ্চিতভাবে লাফ দিয়ে পার হল কেননা এ-জাতীয় মুক্ত-চলনে সে অভ্যস্ত নয়। সুতরাং তেমন লোকের সংখ্যা কম যারা নিজেরাই মাথা-খাটিয়ে অসমর্থতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসছে এবং দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু জনসাধারণ যে নিজেরা জ্ঞানদীপ্ত হবে, তার সম্ভাবনাই বেশি। বস্তুত মানুষকে যদি কেবলমাত্র স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে জ্ঞানদীপ্তি নিশ্চয়ই হবে তার পরবর্তী ধাপ। সর্বকালে কিছু মুক্তচিন্তার মানুষ থাকেন, এমনকি যাঁরা সুবিশাল জনগণের প্রতিষ্ঠিত রক্ষক তাঁদের মধ্যেও, যাঁরা নিজেদের ঘাড় থেকে অপরের অভিভাবকত্বের জোয়াল নামিয়ে দেওয়ার পর, যুক্তিবাদী চিন্তার উদ্দীপনায় প্রতিটি মানুষের কাছে নিজেদের মূল্যায়ন করেছেন এবং সকলকে স্বাধীন চিন্তা করতে শিখিয়েছেন। কিন্তু এও মনে রাখা দরকার, যে-জনসাধারণ (পাবলিক)-এর, কাঁধে রক্ষকরা প্রথমত জোয়ালটি চাপিয়েছিলেন, তারা রক্ষকদেরও এক সম্পর্কদাড়িতে বেঁধে রাখে। কোনও কোনও রক্ষক, জ্ঞানদীপ্তি সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়ে উঠলেও, জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষের বীজ বপন করে থাকেন এবং জনসাধারণ, পরে, তাঁদের বা তাঁদের বংশধরদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং জনগণ ধীরে ধীরে জ্ঞানদীপ্ত হয়ে ওঠে। দেখা যায় কোনও নিষ্ঠুর শাসকের স্বার্থ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে হয়তো মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে-মানুষের চিন্তার জগতে যথার্থ পরিবর্তন হয়নি। বরঞ্চ, নতুন কুসংস্কারের জোয়াল, পুরনোগুলির বদলে, সমান ওজনে বিপুলভাবে চিন্তাশক্তিরহিত জনগণের কাঁধে চেপে বসেছে।

এই জ্ঞানদীপ্তির জন্য কিছুরই প্রয়োজন নেই একমাত্র স্বাধীনতা ছাড়া। বস্তুত উদ্যম সঠিক হলে বোঝা যাবে এর চেয়ে নিরাপদ আর কিছু ব্যবহারযোগ্য নেই। স্বাধীনতা মানে জীবনের প্রতিটি নাগরিক (পাবলিক) ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত যুক্তি-ব্যবহারের অধিকার।[১] কিন্তু আমি চারিদিকে শুধু শুনতে পাই, 'তর্ক কোরো না।' অফিসার বলেন, 'তর্ক কোরো না, লাইনে দাঁড়াও।' খাজনা আদায়কারী বলেন, 'তর্ক কোরো না, খাজনা দাও।' যাজক বলেন, 'তর্ক কোরো না, বিশ্বাসী হও।' কিন্তু দুনিয়ায় এমনও এক রাজপুত্র আছেন যিনি বলেন, 'যত ইচ্ছে তর্ক করো, যা

১ স্বাধীনতার এই সংজ্ঞা নিয়ে তৎকালীন 'সেনসর' আপত্তি জানায়। তখন কান্ট 'প্রাইভেট' এবং 'পাবলিক' শব্দ দু-টির বিশদ ব্যাখ্যা দেন— যা এখানে আছে।

নিয়ে খুশি তর্ক করো, কিন্তু আজ্ঞাপালন করে চলো।' স্বাধীনতা সর্বত্রই শৃঙ্খলাবদ্ধ।

কোন্ বিধিনিষেধ জ্ঞানদীপ্তির পথে অন্তরায় এবং কোন্‌টি বাধা সৃষ্টি না করে বরঞ্চ সাহায্যকারী হয়ে ওঠে? আমি উত্তর দেব: ব্যক্তিগত (পাবলিক) ক্ষেত্রে আমাদের যুক্তিপ্রয়োগ সর্বদাই মুক্ত থাকা উচিত। শুধু এইটুকুই জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানদীপ্তি ছড়িয়ে দিতে পারে। অপরদিকে, স্ব-ক্ষেত্রে (প্রাইভেট) যুক্তির ব্যবহার হয়তো প্রায়ই সীমাবদ্ধ থেকে যেতে পারে এবং তা জ্ঞানদীপ্তির প্রসারকে খুব একটা ব্যাহত করবে না। ব্যক্তিগত (পাবলিক) ক্ষেত্রে স্বীয় যুক্তির ব্যবহার বলতে আমি সেই প্রয়োগের কথা বলছি যা পণ্ডিতরা তাঁদের পাঠকদের স্বার্থে করে থাকেন। স্ব-ক্ষেত্রে (প্রাইভেট) ব্যবহার বলতে আমি সেই যুক্তিপ্রয়োগের কথা বুঝি যা একজন সরকারি আমলা দায়িত্বপালনের জন্য করে থাকেন। জনস্বার্থে বহু কাজ সংঘটিত হয় যেগুলির পদ্ধতি অনেকটা যান্ত্রিক। কিছু কিছু ব্যক্তিকে সেসব কাজ, নিজেদের মধ্যে বিতর্ক না তুলে, শান্তভাবে করে যেতে হয়। এবংবিধ কাজ সরকার জনস্বার্থে করে থাকে এবং ঐ ব্যক্তিরা, কিছু না হোক, সরকারি উদ্দেশ্যসাধনে বাধা সৃষ্টি করে না। এক্ষেত্রে তর্কের কোনও স্থান নেই— নির্দেশপালনই করে যেতে হবে। কিন্তু ব্যক্তি-নাগরিক একই সঙ্গে উক্ত যান্ত্রিক পদ্ধতির অঙ্গ হতে পারে এবং অপরদিকে যখন সে জনসাধারণের (বা বৃহত্তর মানবজাতির) একজন তখন তার ভূমিকা হয় এক প্রবক্তার যে জনগণকে সম্বোধন ক'রে, যথার্থভাবে, তার লেখার মধ্যে দিয়ে কিছু বলছে। সাধারণ মানুষ হিসেবে সে যা-বলছে, কর্মক্ষেত্রে তার নীরবে-পালনীয়-কর্তব্যে সে-বক্তব্য ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে না। যেমন, কোনও অফিসার যদি উপরওয়ালার নির্দেশের উপযুক্ততা বা ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে তর্ক শুরু করেন তবে তাঁর সমূহ ক্ষতি হবে। তাঁর কাজ নির্দেশপালন করা। কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রাহ্য করা উচিত তাঁর চিন্তাশীল ব্যক্তি (স্কলার) হিসেবে মিলিটারী সার্ভিসের ভুলভ্রান্তিত্রুটি জনসাধারণের কাছে বিচারের জন্য পেশ করার অধিকারকে। নাগরিক সরকারকে খাজনা দিতে বাধ্য; বস্তুত খাজনার পরিমাণ নিয়ে তার বিক্ষোভ— অবমাননা (স্ক্যান্ডাল) হিসেবে শাস্তিযোগ্য হতে পারে (কারণ এর ফলে সাধারণভাবে অসন্তোষ দেখা দেওয়া সম্ভব)। কিন্তু সেই ব্যক্তিই নাগরিক হিসেবে অকর্তব্য করছেন না যখন তিনি পণ্ডিত (স্কলার) মানুষের মতো, প্রকাশ্যে, খাজনার পরিমাণ বা অসার্থকতা বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করছেন। সেরকমই ধর্মযাজক গীর্জায় তাঁর শিষ্যদের কাছে ধর্মমহিমা এবং ধর্ম-সমাবেশে গীর্জার প্রতি আনুগত্য প্রচার করতে বাধ্য কারণ তিনি ঐ শর্ত মেনে নিয়েই কাজে নেমেছেন। কিন্তু পণ্ডিত হিসেবে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, এমনকি দায়িত্বও আছে জনসাধারণের কাছে গীর্জার ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাশীল মতামত এবং সুষ্ঠু ধর্মপ্রচার ও ধর্মরক্ষার জন্য নিজস্ব সংশোধনী প্রস্তাব তুলে ধরার। এই কাজ তাঁর বিবেককে পীড়িত করবে না। গীর্জার একজন পদাধিকারী এবং কর্মী হিসেবে তিনি যা শেখাচ্ছেন সেখানে

নিজস্ব মতামত প্রকাশের স্থান নেই, তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে অপর একজনের কথায় এবং নামে। তিনি বলবেন, 'আমাদের চার্চ নানাবিধ শিক্ষা দেয় ; ঐ তার সাক্ষ্যপ্রমাণ।' এইভাবে যাজক উপাসকমণ্ডলীর কাছে ধর্মনির্ধারিত ঘোষণাবলী পেশ করতে পারেন যদিও সেগুলিতে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা না-থাকা সম্ভব। হয়তো ঐসব বাণীতে সত্য লুকানো থাকতেও পারে। যাই হোক না কেন, ঐ বাণীর সঙ্গে তাঁর অন্তরের বিশ্বাসের কোনও বিবাদ নেই। কারণ, তিনি যদি মনে করেন যে তেমন কোনও মৌলিক বিরোধ সত্যি সত্যি রয়েছে তবে তাঁর বিবেক তাকে বাধা দেবে ও তাঁকে কাজটা শেষ-পর্যন্ত ছেড়ে দিতে হতে পারে। সুতরাং যাজক যখন উপাসকমণ্ডলীর সামনে ভাষণ দেন তখন তিনি যে-যুক্তিসমূহ ব্যবহার করেন তা নিতান্তই ব্যক্তিগত (প্রাইভেট) কারণ এই উপাসকমণ্ডলীর সমাবেশ একটি ঘরোয়া ব্যাপার (সংখ্যায় যত বড় হোক না কেন) ; এই উপাসকমণ্ডলীর সঙ্গে যাজকের সম্পর্ক স্বাধীন নয় এবং সে-সম্পর্ক স্বাধীন হতেও পারে না, কারণ যাজক আজ্ঞাবহ। কিন্তু পণ্ডিত (স্কলার) হিসেবে, যাঁর রচনাবলী জনসাধারণ তথা জগতকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয়, তিনি এক অখণ্ড স্বাধীনতার অধিকারী। তখন তিনি জনসমক্ষে নিজস্ব যুক্তি ব্যবহার করছেন এবং ব্যক্তি-মানুষ হিসেবেই নিজের বক্তব্য উপস্থিত করছেন। ধর্মমণ্ডলে যিনি শিষ্য-প্রশিষ্যের অভিভাবক তিনি নিজে এমন একটি কাজে অক্ষম এ এক অসম্ভব কথা এবং এর হাস্যকরতা সীমাহীন।

কিন্তু এমন কি ঘটতে পারে না যে এক শ্রেণীর যাজকদল, হয়তো কোনও ধর্মমণ্ডলী বা অতিসম্মানিত কোনও গুরুসমাবেশ [ডাচ্ জাতিতে যারা নিজেদের 'ক্লাসিস্' বলে পরিচয় দেন] নিজেরাই এক অপরিবর্তনীয় প্রতীকের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন যাতে প্রতিটি শিষ্যর উপর তাঁদের অখণ্ড অভিভাবকত্ব জন্মায় এবং ঐ সূত্রে অনন্ত কাল ধরে একটি জাতির উপরও ? আমার উত্তর হল, তা মোটেই সম্ভব নয়। ঐ জাতীয় কোনও বোঝাপড়া, যা একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে বৃহত্তর মানবজাতির জ্ঞানদীপ্তি থেকে বঞ্চিত করবে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে-চুক্তি সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা সংসদ দ্বারা বা তুমুল ঢাকঢোল-বাজানো শান্তিপ্রস্তাবে সমর্থিত হয়ে থাকলেও। বিশেষ একটি যুগ, তার পরবর্তী সময়কে এমন কোনও শর্তে বাঁধতে পারে না বা তার ভাগ্য এমনভাবে নির্ধারিত করে দিতে পারে না যে নবাগত যুগ তার নিজের জ্ঞানক্ষেত্র (যত সামান্যই হোক না কেন) বাড়াতে পারবে না, নিজের কালের ভুলত্রুটি সংশোধন করতে পারবে না বা সার্মগ্রিক ভাবে জ্ঞানদীপ্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবে না। তার এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করলে মানবপ্রকৃতির প্রতি অপরাধ করা হবে কারণ মানুষের এই আগুয়ান হওয়ার ভিতরই নিহিত আছে তার যথার্থ ভবিষ্যত। আগামীকালের প্রজন্ম যদি ভাবে যে পূর্বপুরুষদের নির্ধারিত অনুশাসনগুলি অপ্রয়োজনীয় এবং অসাধু উদ্দেশ্য সৃষ্ট হয়েছিল এবং সেগুলিকে বর্জন করা উচিত তবে তাদের সে-প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ যুক্তিসম্মত।

যা কিছু শেষপর্যন্ত জনগণের জন্য আইন বলে স্বীকৃত হবে তার মূল্যায়নের কষ্টিপাথর হল এই প্রশ্ন : জনগণ কি চায় সেই আইন তাদের উপর বলবৎ হোক ? এখন, ধর্মের ক্ষেত্রে, একটি সংক্ষিপ্ত এবং স্বল্পমেয়াদী চুক্তি তৈরি করা সম্ভব এই ভেবে যে ভবিষ্যতে এর মধ্যে দিয়ে আরও ভালো কিছু করা যাবে। প্রতিটি নাগরিককে, বিশেষত যাজকদের যাঁরা পণ্ডিতের (স্কলার) ভূমিকায় নেমেছেন তাঁদের, এমন স্বাধীনতা দেওয়া সম্ভব যে তাঁরা মুক্তভাবে জনসমক্ষে লেখা এবং বলায়, বর্তমান প্রতিষ্ঠানের দোষত্রুটির সমালোচনা করবেন। নবগঠিত শৃঙ্খলা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন না ঘটনাবলীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণ সাধারণের স্তরে নেমে আসে এবং এতটা জনগ্রাহ্য হয় যে (মতবিভেদ সত্ত্বেও) **সম্মিলিত** কণ্ঠস্বর রাজসভায় দাবি জানাবে— যাঁরা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে নতুন এবং উন্নততর চিন্তাভাবনার সঞ্চার করেছেন তাঁদের, যাঁরা রক্ষণশীল তাঁদের অসুবিধের সৃষ্টি না করে, আশ্রয় দেওয়া হোক। শুদ্ধু এক প্রজন্মের জন্যও এমন একটি চিরস্থায়ী যৌথ ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত যে-প্রতিষ্ঠান সকল সন্দেহের ঊর্ধে। যদি তা না হয় তবে মানবজাতির উন্নতির পথে সময় অপব্যয় হবে এবং আগামী প্রজন্মের ক্ষতি হবে। নিজের ক্ষেত্রে (কেবল স্বল্প সময়ের জন্য) কোনও ব্যক্তি জ্ঞানদীপ্তিকে সরিয়ে রাখতে পারে ; কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা, এবং আরও বিস্তৃতভাবে, পরবর্তী বংশধরদের জন্য তাকে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করে দেওয়া, হবে মানবাধিকারের উপর আঘাত এবং পদদলন।

জনসাধারণ নিজেদের জন্য যে-আইন চায় না, রাজার পক্ষেও তাদের জন্য তেমন আইন প্রণয়ন অসম্ভব কারণ তাঁর আইনপ্রণয়নকারী অধিকার দাঁড়িয়ে আছে জনসমষ্টির সঙ্গে তাঁর নিজের ইচ্ছার মিলনে। রাজা যদি দেখেন যে যথার্থ উন্নয়ন এবং তথাকথিত প্রাগ্রসরতা নাগরিক শৃঙ্খলার সঙ্গে একত্র হয়েছে তবে জনসাধারণ তাদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে যা মন চায় করুক। এ-নিয়ে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। যদিও তাঁকে যতটা সম্ভব নজর রাখতে হবে যে একে অপরের ধর্মচর্চা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপর যেন জুলুম না করে। এসব ঘটনায় নাক গলালে রাজার সম্মানহানি হয় কারণ জনসাধারণের লিখিত আবেদন থেকেই তিনি নিজের শাসনকর্মের মূল্যায়ন করে নিতে পারেন। তিনি তখনই হস্তক্ষেপ করবেন যখন সমস্যাটা তিনি স্বয়ং গভীরভাবে বুঝতে পেরেছেন এবং জানেন 'সীজারও বৈয়াকরণিকদের ঊর্ধে নন।'[১] তার পরই তিনি স্থির করবেন যে এবার ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তার চেয়েও বড় কথা রাজা যদি নিজের রাজ্যে প্রজার উপর কিছু ধর্মীয় উৎপীড়কের অত্যাচারকে সমর্থন করেন তবে তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে।

আমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আমরা কি এখন এক **জ্ঞানদীপ্ত যুগে** বাস করছি ? তার

১. কথিত আছে 'ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট' ভলতেয়ারের এক বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই উক্তি করেছিলেন। কিন্তু তার আগে, ১৯১৪ সালে, অনুরূপ মনোভাব সম্রাট সিজিসমুন্দো প্রকাশ করেছিলেন কাউনসিল অফ কনস্টানস-এ।

উত্তর হবে, 'না'। কিন্তু আমরা এখন যে যুগে রয়েছি তা **জ্ঞানদীপ্তির যুগ**[১]। চারদিকে আজ যা ঘটছে তাতে বোঝা যায়, ধর্মীয় স্তরে মানুষের নিজস্ব এবং বাইরে থেকে নির্ধারিত নয় এমন বিচারবুদ্ধি সঠিকভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি আছে বা সহজেই সৃষ্ট হচ্ছে। অপরদিকে, আমরা পরিষ্কার লক্ষ করছি এমন একটি ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে যেখানে মানুষ স্বাধীনভাবে এসব চিন্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে। সাধারণ জ্ঞানদীপ্তির পথের বাধা ক্রমে অপসারিত হচ্ছে এবং মানুষ স্বেচ্ছায় অপরের হাতে নিজের অভিভাবকত্ব তুলে-দেবার প্রবণতা থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হচ্ছে। সেই অর্থে এটি জ্ঞানদীপ্তির যুগ, ফ্রেডরিক-এর শতাব্দী।

যে-রাজপুত্র মনে করতে কুণ্ঠিত হন না যে ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁর প্রজাদের কিছু বলার নেই এবং সে-বিষয়ে প্রত্যেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন— তিনি এই মনোভাবকে 'সহনশীলতা'র মতো ভারিক্কি উপাধি দেননি। তিনি স্বয়ং আলোকপ্রাপ্ত। এখনকার লোকজনদের এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন এইজন্য যে তিনিই প্রথম, অন্তত প্রশাসনিক ভাবে, জনসমষ্টিকে অপরের অভিভাবকত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং প্রতিটি মানুষ, বিবেকের ক্ষেত্রে, স্বীয় যুক্তি খাটানোর স্বাধীনতা পেয়েছে। তাঁর সামনে, মাননীয় যাজকদল নিজেদের কর্তব্যকর্ম পালন করায় কোনও ত্রুটি না রেখে, পণ্ডিতদের মতো জনসমষ্টির কাছে তাঁদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি— যেগুলি কখনও কখনও প্রচলিত ধ্যানধারণার ব্যতিক্রম— পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করেছেন। যাঁরা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত তাঁরা তো আরও স্বাধীনতা উপভোগ করেছেন। এই স্বাধীনতার উদ্দীপনা দেশের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি অনেক স্থানে পৌঁছেছে যেখানে স্বাধীনতার সঙ্গে এমন সব প্রতিবন্ধকতার লড়াই চলছে যে-বাধাগুলি তাদের দেশের সরকার, নিজেদের স্বার্থ না বুঝেই তৈরি করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সরকার অকারণে ভাবতে পারে যে, স্বাধীনতা দেশের জনগণের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে। মানুষ, ক্রমে ক্রমে, তখনই, বর্বর যুগ অতিক্রম করতে পারে যখন তার সামনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাধার সৃষ্টি না করা হয়।

আমি জ্ঞানদীপ্তির মূল সূত্রটি পেশ করলাম— মানুষের স্বেচ্ছানির্বাচিত পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি— এবং এটি কার্যকর প্রধানত ধর্মীয় ক্ষেত্রে কারণ দেশশাসকদের শিল্প বা বিজ্ঞানের জগতে অভিভাবকের ভূমিকায় নামার কোনও উৎসাহ নেই। অধিকন্তু, অযোগ্যের হাতে ধর্মাধিকার শুধু যে ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক তাই নয়— এটি চরম অবমাননাকরও বটে। কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞানদীপ্তির প্রতি দেশশাসকের অনুকূল মনোভাবের প্রতিক্রিয়া আরও সুদূরপ্রসারী। তিনি লক্ষ করেন যে প্রজারা যদি সর্বসমক্ষে তাদের যুক্তিবিচার ব্যবহার করে এবং তাদের চিন্তাভাবনা লিখিতভাবে প্রকাশ করে তবে আইনশৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনও ভয় নেই। বরঞ্চ বর্তমানকালের আইনকানুনের মুক্ত সমালোচনা হলেই ভবিষ্যতে আইনপ্রণয়নের মান আরও উন্নত হবে। জ্ঞানদীপ্ত

১. 'আমাদের যুগ, বিশেষভাবে, সমালোচনার যুগ (এজ অফ ক্রিটিসিজম) এবং সমস্ত কিছু সমালোচনার মুখাপেক্ষী'—'ক্রিটিক অফ পিওর রীজন'-এর ভূমিকা থেকে।

শাসকের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আমাদের মাননীয় সম্রাটের চেয়ে এ-বিষয়ে আর কেউ উজ্জ্বলতর নন।

যিনি স্বয়ং জ্ঞানদীপ্ত তিনি আর ছায়াকে ভয় পান না। দেশে শান্তিরক্ষার জন্য তাঁর অগণ্য দক্ষ সৈন্য রয়েছে। তিনি বলতে পারেন, 'যত ইচ্ছে তর্ক করো, যে বিষয় নিয়ে ইচ্ছে তর্ক করো, কেবল আদেশপালন করো।' কোনও প্রজাতন্ত্র এ-কথা বলার সাহস পাবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে মানবসমাজের ঘটন-অঘটনে এক অভাবনীয় ও বিস্ময়কর প্রবণতা যার ফলে, বিস্তৃতভাবে, সবকিছুই ধাঁধা বলে ঠেকবে। মনে হয় দেশবাসীর মানসিক মুক্তির পথে সাহায্যকারী বুঝি অধিকতর নাগরিক স্বাধীনতা। অথচ এর ফলে আরোপিত হয় অপরিহার্য সীমাবদ্ধতা; কিছুটা কম নাগরিক স্বাধীনতা, অপরদিকে, মানবমনকে পূর্ণ বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়। প্রকৃতি যেমন শক্ত আবরণের ভিতর বীজকে সযত্নে পালন করে এবং পরে তাকে উন্মুক্ত করে, তেমনই স্বাধীন চিন্তা করার প্রবণতা ও আসক্তি ক্রমে জনগণের চরিত্রের উপর প্রভাব ছড়ায় এবং জনগণ স্বাধীনতার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত, এর ফলে সরকারি নীতিসমূহও প্রভাবান্বিত হয়। সরকার ক্রমে বুঝতে পারে যে মানুষ যন্ত্রের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু এবং সরকারি স্বার্থেই, নাগরিকদের সঙ্গে, তাদের যোগ্য মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করা, অধিকতর সুবিধাজনক।[১] □

অনুবাদক : উৎপলকুমার বসু

□ সংযোজন : একটি চিঠি □

হিশবার্গ
১৮. ৫. ৯৫

প্রিয় উৎপল,

এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর সমাপতন আর কী হতে পারে : আপনারা যখন ঘাটশীলায় সম্মেলন করছিলেন, আমরাও এখানে, গ্রোস-সাক্সেনে, ইমানুয়েল কান্টের 'এনলাইটেনমেন্ট কী : এই প্রশ্নের উত্তর' (Beantwortung der Frage : was ist Aufklärung ? / ১৭৮৩) নিয়ে পাঠচক্রে মেতে ছিলাম। আপনাদের মত অত ঋদ্ধ অ্যাকাডেমিক হয়তো ছিল না এই অনুষ্ঠান। অভিশ্রুতি বাদ দিলে 'aufklaren' শব্দটির প্রাথমিক একটি অভিধা — আকাশ পরিষ্কার হয়ে-আসা — মনে রেখে শুরুতেই 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' গানটি গাওয়া হয়। অতঃপর কান্টের পুরো কথিকাটি কোলাজের ছাঁচে অভিনয় করা গেল। বিশেষত তৃণমূল আন্দোলনের ছেলেমেয়েরা ও সবুজ-

১. আলোচ্য প্রশ্নটির মেণ্ডেলস্‌সোন প্রদত্ত উত্তর আজই আমি তেরই সেপ্টেম্বরের 'বুশিঙস্‌চে ভোখেনট্‌লিশে নাখরিখটেন'-এর 'বেরলিনিশে মোনাটস্‌ক্রিফট' প্রতিবেদনে পড়লাম। মূল লেখাটি আমার হাতে পৌঁছায়নি। যদি আগে জানতাম, তবে এই প্রবন্ধটি হয়তো প্রকাশ করতাম না। এখন করছি শুধু দেখার জন্য যে কতখানি মতের মিল দৈবক্রমে ঘটতে পারে। [মেণ্ডেলস্‌সোন-এর উত্তর ছিল এই যে বুদ্ধি (বা ইনটেলেক্ট)-এর পরিচর্যায় জ্ঞানদীপ্তি প্রকাশ পায় যা বাস্তব জগত থেকে আলাদা। কান্ট, তাঁর পরবর্তী তত্ত্ব ও ব্যবহার-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মতোই, এখানেও এই প্রভেদকে মৌলিক পার্থক্য বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ।]

পন্থীরা ঐ নাটকে অংশ নিয়েছিল। কান্টের বয়ানের মধ্যে যেখানেই উপরওয়ালা বা অবিবেকী অভিভাবকদের প্রস্তর উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, সে সব অংশ ঈষৎ বিনিয়ে, সময়োচিত কিছু প্রক্ষেপ থাকায়, পরিবেশিত হবার পর, আলোচনাচক্রে যে অপূর্ব উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল তার তুলনা নেই।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, ইয়োরোপেও, এই মুহূর্তে সমাজের মানুষকে অপ্রাপ্তবয়স্ক করে রেখে দেবার ঊর্ধ্বতন যে-প্রবর্তনা লক্ষ করা যাচ্ছে তার প্রেক্ষিতে কান্টের এই সন্দর্ভ ভগবদ্‌গীতার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ববহ বলে মনে হয়। মৌলবাদের বিরুদ্ধে 'তোমার নিজের কাণ্ডজ্ঞানের পরিচর্যার সাহস পোষণ করো!' এইটেই হলো এনলাইটেনমেন্টের নির্বাচনী মন্ত্র।' এরকম উচ্চারণ এখুনি তো শ্লোগান হওয়া উচিত। অথবা 'খরচপত্তর করতে পারলে আমার আদৌ ভাবনাচিন্তার দরকার পড়ে না; অন্যেরাই আমার হয়ে ঐ বিষয় ব্যাপার সামলে দেবে', এই নির্ধারণের প্রযুক্ত নমুনা আমরা কি পথেঘাটেই অধুনা প্রত্যক্ষ করছি না? কি-পার্টির চাঁদার খাতা কি-গুরুবাদের পোষকতায় মনোহীন নাবালকত্বের পরিকল্পিত প্রযোজনা আমাদের স্বকীয় প্রতীতির সাহস (Zivilcourage) একরকম পরিলুপ্ত করে দিতে চলেছে।

কাইজারদের দিন কবেই চুকেবুকে গেছে। তবু কোন্ ফাঁকে উঠে এসেছে, কান্টেরই ভাষায়, 'কিছু যথেচ্ছাচারীর বুদ্ধিমত্তাপ্রসূত সার্বভৌমতা'র উপসর্গ। 'ব্যাকরণবেত্তাদের উপরে তো স্বয়ং কাইজারও নন' (Caesar non est supre grammaticos), কান্টের এই সাবধানবাণী তা সত্ত্বেও কেন আমরা এখনো সহজ সুরে আবৃত্তি করতে পারছি না? অথবা ধনতন্ত্রের সহযোগী পরিকল্পিত যন্ত্রায়নের দুলাল কম্পিউটারের দৌলতে যখন 'think small' (বাংলাটা কী করব উৎপল? অল্প ভাবো, না নিম্নস্তরে ভাবতে শেখো?) বিজ্ঞাপনের মুখরোচক বুলি হয়ে উঠেছে, কান্টপ্রেরিত যন্ত্রাতিশায়ী মানুষের প্রতি শাসকসংস্থার সসম্মান আচরণের প্রত্যাশা মন থেকে মুছে ফেলব?

সবচেয়ে বেশি মুশ্‌কিল বোধহয় আমাদেরই এখন, যারা শিল্পসাহিত্য নিয়ে কখনো-সখনো মাথা ঘামিয়ে থাকি। প্রায়শই আমরা ধরে নিই, নান্দনিকের এলাকায় ভাবের ঘরে চুরি করার মস্ত অবকাশ রয়ে গেছে। আমরা ভুলে যাই নন্দনতত্ত্বের মাধ্যাকর্ষ তথাকথিত সুন্দর নয়, সংবেদন। জানতে চাই না বোধশক্তি অসাড় করে দেওয়া অ্যানীস্থীসিয়া-র ঠিক অন্য মেরুর ঘটনা নন্দনবিবেক। এনলাইটেনমেন্টের অভিঘাতে বাউমগার্টেনের শিল্পশাস্ত্র তারি ফসল। সংগীতে বাখ্ থেকে মোৎসার্ট পর্যন্ত একই চৈতন্যের সম্পাত। ফরাসি সাহিত্যে সাহসিকতার উদ্বোধন ও সমীপবর্তী সংঘটন। আমরা আজ যারা ছবি আঁকছি বা কবিতা লিখছি তাদের কাছে ঐ আলোকপুঞ্জের উত্তরাধিকার শুধু অস্পষ্টই নয়, কেমন যেন হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে। আমরা যান্ত্রিক অনুশীলন ও বিধিবদ্ধ অভ্যাসের ক্রীতদাস্যে অগাধ স্বস্তির সামিল হয়েছি এখন। কান্ট তাঁর এই রচনায় কি আমাদেরই প্রফুল্ল নির্বেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান নি?

অলোকরঞ্জন

[বর্তমান সংখ্যার প্রস্তুতি চলাকালীন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত উৎপলকুমার বসুকে চিঠিটি লেখেন। —যোগসূত্র]